সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এইডস সংক্রমণের ঝুঁকিতে শিক্ষার্থীরা

মো. রমজান আলী

মানব সভ্যতাকে যে রোগগুলো হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে, প্রাণঘাতী এইডস তার মধ্যে অন্যতম। এটি একটি নীরব ঘাতক। এ রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়। তখন যেকোনো সংক্রামক জীবাণু সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে রোগীর সংখ্যা আশংকাজনক হারে বাড়ছে, যা স্বাস্থ্য খাতের জন্য নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্ত ঘেঁষা যশোর, চুয়াডাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজারসহ বেশ কয়েকটি জেলায় সংক্রমণের হার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে আয়োজিত এক স্বাস্থ্য বিভাগের বৈঠকে জানা যায়, ২০২৪ সালে এ হাসপাতালে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ২৫ জন। চলতি বছরের অর্ধেক সময়েই তা দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৯১৭ জনের এইচআইভি পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭ জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে ২৩ জন পুরুষ ও ১৪ জন নারী এর মধ্যে ২৫ জন শিক্ষার্থী যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন এত সংখ্যক শিক্ষার্থীর আক্রান্ত হওয়া ভবিষ্যতের জন্য বড় হুমকি। একই ধরনের চিত্র দেখা যাচ্ছে কক্সবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। গত জুন মাসে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে দ্বিতীয়বার একজন এইডস রোগী সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কোভিডের সময় এই হাসপাতালেই আরেকজন এইডস রোগী প্রথমবার সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর পর একই রোগে আক্রান্ত আরেকজন নারী সন্তান জন্ম দিয়েছেন। এইডস রোগীদের সরকারিভাবে চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য একটি অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) সেন্টার চালু রয়েছে।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক পাচার ও সেবন, অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক এবং বিদেশফেরত কর্মীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব এ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে এখনও এইচআইভি নিয়ে ব্যাপক কুসংস্কার রয়েছে। অনেকেই পরীক্ষা করাতে চান না, আবার আক্রান্তরাও লুকিয়ে থাকেন। ফলে চিকিৎসা পাওয়া কঠিন হয় এবং সংক্রমণও বেড়ে যায়। যশোরের এক রোগী জানান--বিদেশে কর্মরত অবস্থায় ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও দীর্ঘদিন তা বুঝতে পারেননি তিনি। দেশে ফেরার পর অসুস্থ হলে পরীক্ষা করে জানা যায়, তিনি এইচআইভি পজিটিভ। কিন্তু সামাজিক লজ্জা ও ভয়ের কারণে তিনি দীর্ঘদিন চিকিৎসা নেননি। ফলে পরিবারের আরো সদস্য সংক্রমণের শঙ্কায় পড়েছেন। এমন ঘটনা সীমান্তবর্তী জেলায় অজস্র, যা প্রকাশ্যে আসছে না শুধুমাত্র সামাজিক চাপের কারণে।

জাতিসংঘের এইডস বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইডস)-এর মতে, বাংলাদেশ এখনও নিম্ন সংক্রমণ হার বিশিষ্ট দেশ হলেও সীমান্তবর্তী এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। এ এলাকার তরুণরা অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়। যশোর সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। ভারত থেকে মানুষের অবাধ যাতায়াত, মাদক সেবন ও পাচার, যৌনপল্লির উপস্থিতি এবং নিরাপদ যৌন আচরণের অভাব সংক্রমণ বাড়াচ্ছে। এ ভাইরাস রোগীর দেহ থেকে অন্যের শরীরে ছড়ায় রক্ত ও বীর্যের মাধ্যমে। বীর্যের মাধ্যমে সংক্রমিত হয় বলেই এই রোগকে ‘সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ’ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ রোগের লক্ষণগুলোর মধ্যে হলো- ঘন ঘন জ্বর হওয়া ও এক-দেড় মাস ধরে একটানা জ্বর। জ্বরের সঙ্গে গলায় অস্বাভাবিক ব্যথা হয়। খাবার খেতে ও গলা দিয়ে নামতে সমস্যা হয়। প্রায় ৮৮ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যেই গলায় র‍্যাশ দেখা দেয়। তীব্র প্রদাহ হতে শুরু করে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ঘাম। ঘুমের মধ্যেও তীব্র ঘাম হয়। শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে বলে অল্পতেই বমি ভাব ও পেটের সমস্যা দেখা যায়।

বর্তমানে দেশে প্রায় ১৪ হাজারেরও বেশি এইচআইভি আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। যার মধ্যে শনাক্তকৃত সংখ্যা তুলনামূলক কম। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রকৃত সংখ্যা এর দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে। এইডস এখন নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তা ধীরে ধীরে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে এই মরণব্যাধি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক সংক্রমণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। ইনজেকশনের সুচ ব্যবহার বিশেষত মাদকসেবীদের মধ্যে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। অভিবাসী শ্রমিক বা বিদেশফেরত কর্মীরা সচেতনতার অভাবে পরিবারে ভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সামাজিক লজ্জা ও কুসংস্কারের ভয়ে পরীক্ষা ও চিকিৎসা নিতে মানুষ পিছপা হচ্ছেন।

এইডস একটি প্রাণঘাতী রোগ হলেও, সময়মতো চিকিৎসা ও সচেতনতার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আধুনিক কিছু ওষুধে রোগীর জীবন কিছুদিন বাড়ানো গেলেও সেসব চিকিৎসা পদ্ধতি মোটেও মধ্যবিত্তের আয়ত্তে নেই। সরকার বিভিন্ন জেলায় ভলান্টারি কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার (VCT) চালু করেছে। এইডস আক্রান্ত রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে ১৩টি হাসপাতালে অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) সেন্টার চালু রয়েছে। এর মধ্যে যশোর একটি। যশোরে এইচআইভি পজিটিভ শতাধিক মানুষ রয়েছে। বর্তমানে যশোর সদর হাসপাতালের এআরটি সেন্টারে ২২০ জন এইচআইভি রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাদের মধ্যে যশোর ছাড়াও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার মানুষ রয়েছেন। এইডস রোগীদের সামাজিক অবস্থান যেন নষ্ট না হয় সেজন্য আমরা সচেষ্ট আছি। তাদের বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে আক্রান্তদের শতকরা ৯৫ ভাগ চিকিৎসার আওতায় আনার সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিওগুলো মাঠপর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাচ্ছে।

এইডস প্রতিরোধে সমগ্রদেশে ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো খুবই প্রয়োজন। কনডম ও নিরাপদ সুচ ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। স্কুল-কলেজে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অভিবাসী শ্রমিকদের দেশে ফেরার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে, কারণ বর বা কনে যদি এই ভাইরাসের বাহক হয়, তবে যৌন সম্পর্কের ফলে অন্যের শরীরে সহজেই প্রবেশ করবে এই ভাইরাস। প্রতিবার ইঞ্জেকশন নেয়ার সময় নতুন সিরিঞ্জ ও সূচ ব্যবহার করতে হবে। রোগাক্রান্ত প্রসূতির সন্তানের শরীরেও এইডস হতে পারে। সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ যৌন পেশাদারদের ক্ষেত্রে এই রোগের প্রভাব বেশি থাকে। মুমূর্ষু অস্থায় রক্তের প্রয়োজন হলে অবশ্যই এইডস পরীক্ষা করে শরীরে রক্ত দিতে হবে।

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে প্রতিরোধমূলক সেবা পৌঁছে দেওয়া, সহজে টেস্টের সুযোগ তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করার সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, অনেক রোগী সন্দেহজনক লক্ষণ দেখা দিলেও পরীক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন, যা প্রতিরোধ কার্যক্রমে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে সরকারের সরবরাহকৃত এআরটি ওষুধ পর্যাপ্ত আছে এবং চিকিৎসা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি সিভিল সার্জন কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধে একযোগে কাজ চলছে। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজে এইডস সংক্রমণ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছে। অনেকেই ভুলভাবে মনে করেন, হাত মেলানো, একই প্লেটে খাওয়া বা পাশে বসে থাকার মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায়—যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের ভুল ধারণা কেবল রোগীদের সামাজিকভাবে আরও কোণঠাসা করে তোলে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে উঠা-বসা দোষের নয়। তাদের সঙ্গ দেওয়া যায়। এ ধরনের রোগী নিয়মিত চিকিৎসা নিয়ে স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে পারে।

সীমান্তবর্তী জেলায় রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পুরো দেশের জন্য সতর্ক সংকেত। এইডস প্রতিকারের ব্যবস্থা যেহেতু এখনো অজ্ঞাত, সেহেতু প্রতিরোধই হবে এইডস থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। মরণব্যাধি এইডস থেকে বাঁচতে হলে সবার সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। শুধু অসচেতনতার কারণে আমাদের দেশে এইডসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এখন থেকেই সচেতন করতে না পারলে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে। গণমাধ্যম, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাই এখনই ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ আরো বড় স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এইডস নির্মূলে এগিয়ে আসতে হবে। এইডস প্রতিরোধে গণসচেতনতাই এখন মুখ্য বিষয়। তাই এইডস প্রতিরোধে প্রয়োজন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং কার্যকর পদক্ষেপ।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার